১৯২০-র দশকের শেষ দিনগুলিতে এক বিধ্বংসী অর্থনৈতিক সংকটের অভিঘাত বিশ্ব অর্থনীতিকে বিপন্ন করে তুলেছিল। এই সংকট ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চলেছিল, যা বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশগুলির কাছে এক অশুভ বার্তা বহন করে এনেছিল। বিশ্বজোড়া এই আর্থিক সংকটকে ঐতিহাসিক ও অর্থনীতিবিদেরা 'মহামন্দা' (Great Depression) হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির বিপুল ক্ষতি হয়েছিল এবং যুদ্ধের জন্য তাদের অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। ১৯২০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপীয় অর্থনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে শুরু করে। জার্মান ক্ষতিপূরণ সমস্যাকে কেন্দ্র করে জার্মানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে উদার হাতে ঋণ পেয়েছিল। অন্যান্য ইউরোপীয় দেশও মার্কিন ঋণের দ্বারা চূড়ান্ত উপকৃত হয়েছিল। ১৯২০-র দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের সব চেয়ে উত্তমর্ণ দেশে পরিণত হয়। আমেরিকান টাকার সহজ আমদানির পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ জনিত আর্থিক সংকট থেকে ইউরোপীয় অর্থনীতি অনেকটাই নিষ্কৃতি পেয়েছিল। ইউরোপীয় অর্থনীতির এই পুনরুজ্জীবনকে অনেকেই "রমরমা বিশের দশক" (roaring twenties) বলে বর্ণনা করেছেন। ১৯২০-র দশকে, বিশেষ করে ১৯২৪-১৯২৯ সালের মধ্যে ইউরোপীয় অর্থনীতির একটা সমৃদ্ধি সত্যি সত্যিই লক্ষ করা গিয়েছিল। ডেভিড থমসন যথার্থই বলেছেন—অর্থনীতির এই তেজি ভাবের কেন্দ্র ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যেখানে এটি ছিল প্রকৃত অর্থেই রমরমা বিশের দশক (The centre of this boom was the United States, where it was indeed the roaring twenties.)। এটি ছিল প্রাচুর্যের যুগ। বিশ্ব অর্থনীতির বিকাশের প্রক্রিয়া আবার নতুন করে শুরু হল। কিন্তু একই সঙ্গে দেখা গেল যে এই সময় কৃষি পণ্যের মূল্য অল্প সময়ের জন্য বৃদ্ধি পেলেও তা আবার কমতে শুরু করে। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এরিখ হব্‌স্‌বম তাঁর *Age of Extremes* গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন—রমরমা বিশের দশক কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি খামারগুলির কাছে সুবর্ণ যুগ ছিল না (The roaring 1920s were not a golden age on the farms of the USA.)। মৌলিক উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাস উত্তর আমেরিকার

কৃষকদের প্রবল অসুবিধায় ফেলেছিল। তাছাড়াও হব্‌স্‌বম লিখেছেন—এই সময়ে অর্থাৎ ১৯২০-র দশকে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলিতে বেকার সমস্যা তীব্র রূপ নিয়েছিল। ১৯২০-র দশকে ইউরোপীয় অর্থনীতির তেজিভাবের মূল কারণ ছিল ইউরোপের শিল্প জগতে আন্তর্জাতিক পুঁজির দ্রুত অনুপ্রবেশ। বিশেষ করে জার্মানির ক্ষেত্রে এটি ছিল পুরোপুরি সত্যি। যে মুহূর্তে জার্মানি থেকে আমেরিকান আর্থিক সাহায্য প্রত্যাহৃত হল, সে মুহূর্তেই জার্মান অর্থনীতির দুর্বলতা ও নিরাপত্তাহীনতা সর্বসমক্ষে উদ্‌ঘাটিত হল।

মার্কিন নীতি নির্ধারকরা এই মারাত্মক অবস্থার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন না। আমেরিকার কেন্দ্রীয় ব্যাংক Federal Reserve Bank বিভিন্ন দেশকে সহজ শর্তে ঋণ দেওয়ার বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখিয়েছিল। শেয়ার বাজারগুলিতে ফাটকা বিনিয়োগ ক্রমশ বেড়ে চলল। ওয়াল স্ট্রিটের শেয়ারগুলির গড় মূল্য ১৯২৮ সালে ২৫ শতাংশ এবং ১৯২৯ সালে আরও ৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। দ্রুত লাভের আকাঙ্ক্ষায় একদল অপেশাদার ফাটকা কারবারি শেয়ার বাজারগুলিতে ভিড় জমাল। কিন্তু এগুলি অর্থনৈতিক চালচিত্রের প্রকৃত সূচক ছিল না। মৌলিক উৎপাদিত পণ্যের মূল্য হ্রাস প্রমাণ করল যে পণ্যগুলির চাহিদা পণ্য উৎপাদনের তুলনায় বেশ কম।

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং শিল্প ও কৃষির বিপুল উৎপাদনী ক্ষমতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে একটি ধনী দেশে পরিণত করেছিল। বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উদার হাতে ঋণ দিয়েছিল, কারণ তার উদ্দেশ্য ছিল অধমর্ণ দেশগুলি তার নিজস্ব পণ্যগুলি ক্রয় করুক। মার্কিন ডলারের বিরামহীন অনুপ্রবেশ অবশ্যই যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। কিন্তু এর একটা খারাপ দিকও ছিল। মার্কিন অর্থনীতিতে সংকট দেখা দিলে ইউরোপীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ার প্রবল সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। ১৯২৯ সালের শেষ দিকে ঠিক এই ঘটনাই ঘটে গেল।

সংকটের প্রথম কম্পন অনুভব করলেন উত্তর আমেরিকার কৃষকরা। তাঁরা দেখলেন ইউরোপীয় বাজারে তাঁদের উৎপাদিত পণ্যের রপ্তানি উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে, এই সময়ের মধ্যে খাদ্যপণ্য সমেত অন্যান্য কৃষিপণ্য উৎপাদনে ইউরোপ স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। মূলত এই কারণেই ১৯২৬ সাল থেকে কৃষিজ পণ্যের দাম কমতে থাকে। ক্ষতিগ্রস্ত আমেরিকান চাষি তার প্রাত্যহিক ব্যয় হ্রাস করতে বাধ্য হয়। কৃষকদের ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পাবার অভিঘাত মার্কিন শিল্পেও অনুভূত হয়। তবে ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে

মার্কিন শেয়ার বাজারের ভেঙে পড়া প্রকৃত সংকটের সূচনা করেছিল। মার্কিন শেয়ার বাজার ওয়াল স্ট্রিট দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন সমৃদ্ধির পর হঠাৎ ভেঙে পড়ে। ১৯২৯-র ২৪ অক্টোবর সংকটের সূচনা হল। ভীত ও সন্ত্রস্ত্র ফাটকা কারবারিরা তাদের শেয়ার তুলে নিতে থাকেন। সে দিন প্রায় ১৩ মিলিয়ন শেয়ার হস্তান্তরিত হয়েছিল। ১৯২৯ সালের ২৯ অক্টোবর মার্কিন শেয়ার বাজার চূড়ান্ত আঘাত পেল। দিনটি 'কালো মঙ্গলবার' (Black Tuesday) নামে পরিচিত। সে দিন ১৬.৫ মিলিয়ন শেয়ার বিক্রি হল। ওয়াল স্ট্রিট সংকট একই সঙ্গে আমেরিকার কৃষিপণ্য মূল্যের চরম সংকট নিয়ে এল। নিউ ইয়র্ক শেয়ার বাজারের মারাত্মক পতন মহামন্দার (Great Depression) সূচনা করেছিল। জেমস জল তাঁর *Europe Since 1870* গ্রন্থে লিখেছেন—বিশ্বের সব চেয়ে বড় ও ধনী পুঁজিপতি সমাজে স্নায়ুর পতন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাইরেও বাস্তব ও প্রতীকী ফল প্রসব করেছিল এবং যার ওপর ভিত্তি করে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছিল তার স্থিতিশীলতার অভাব স্পষ্ট হয়ে উঠল (This loss of nerve in the greatest and richest capitalist society in the world had both practical and symbolic effects far beyond the United States itself, and its consequences demonstrated the instability on which the European recovery had been based.)। ১৯৩০ সালে পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটল। আর্থিক সংকটের মারাত্মক তীব্রতা সত্ত্বেও মানুষ তখনও বিশ্বাস করেছিল এটি একটি সাময়িক বিপর্যয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই স্বাভাবিক পরিস্থিতি ফিরে আসবে। ই. এইচ. কার লিখেছেন—কিন্তু ১৯৩০-৩১ সালের শীতকালে শেষ প্রত্যাশার রেশটুকু মুছে গেল এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা মনে করতে লাগলেন সভ্যতার ধ্বংস আগতপ্রায় (But the winter of 1930-31 shattered the last defences of optimism ; and serious people began to talk of the impending collapse of civilization)।

ইউরোপীয় অর্থনীতির ওপর ওয়াল স্ট্রিট সংকটের প্রতিক্রিয়া ছিল মারাত্মক। খাদ্যপণ্য ও কাঁচামালের মূল্য হ্রাস পাবার ফলে পূর্ব ইউরোপের কৃষি নির্ভর দেশগুলি ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে উত্তর ও পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলির শিল্পজাত পণ্যের চাহিদা প্রবল ভাবে হ্রাস পায়। কৃষকরা তাঁদের বাজার হারালেন এবং শিল্প শ্রমিকরা হারালেন তাঁদের কর্মসংস্থান। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থের তীব্র ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে আমেরিকার বিনিয়োগকারীরা ইউরোপের আর্থিক বাজার থেকে স্বল্প মেয়াদি ঋণ প্রত্যাহার করে নিতে থাকেন। এটি ছিল ইউরোপীয় অর্থনীতির ওপর চরম আঘাত এবং তার ফলে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয় জার্মানি,

কারণ জার্মানির অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন পুরোপুরি বিদেশি পুঁজির আমদানির ওপর নির্ভরশীল ছিল। বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশ পূর্ত ও নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এবং ঐ সমস্ত কাজের সঙ্গে যুক্ত সংস্থাগুলি তাদের বহু শ্রমিককে কর্মচ্যুত করে।

কৃষিপণ্য মূল্যের বিধ্বংসী পতন ও শিল্পে ব্যাপক ছাঁটাই-এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩০ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার যাবতীয় ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যায়। ই. এইচ. কার-এর মতে ১৯৩১ সাল ছিল "বিপর্যয়ের বছর" (the year of disaster)। এই বছর মারাত্মক আর্থিক সংকটের সাক্ষী হয়ে রইল। ১৯৩১-এর মে মাসে অস্ট্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাংক 'ক্রেডিট আন্‌স্টালট' (Credit Anstalt) ব্যাংক-এর পতন ঘটে। মানুষের ত্রাস ও ভয় জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করে। জুলাই মাসে অতি বৃহৎ জার্মান ব্যাংক 'ডার্মস্টাডার উন্ড ন্যাশনাল ব্যাংক' (Darmstadter und National Bank) দেউলিয়া হয়ে পড়ে। বিদেশি লগ্নিকারীরা তাদের স্বল্পমেয়াদি ঋণ তুলে নিতে থাকে। ফলে জার্মানির রাইখ্‌স ব্যাংক তার ৫০,০০০,০০০ পাউন্ড মূল্যের স্বর্ণ সম্পদ খোয়াল। একমাত্র চেকোস্লোভাকিয়া ছাড়া মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের যাবতীয় ক্ষুদ্র দেশগুলি তাদের বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। কৃষিপণ্য মূল্যের শোচনীয় পতন দক্ষিণ গোলার্ধে অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনার অর্থনীতির ওপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছিল। দু'টি দেশই ১৯২৯-এর অন্তিম লগ্নে স্বর্ণের মাধ্যমে ঋণ পরিশোধ স্থগিত রাখল। অর্থনৈতিক মন্দা ব্রাজিলের কফির বাজারের ওপর প্রতিকূল প্রভাব ফেলেছিল এবং তার ফলে ব্রাজিলের অর্থনীতি ভয়াবহ ক্ষতির শিকার হল। কিছুদিনের মধ্যেই ব্রাজিলীয় অর্থনীতি দেউলিয়া হয়ে পড়ে। অস্ট্রেলিয়া ও আর্জেন্টিনাকে অনুসরণ করে ব্রাজিলও স্বর্ণের মাধ্যমে পাওনা মেটানো স্থগিত রাখে। এই বিপর্যয়গুলি ব্রিটিশ অর্থনীতির কাছে এক অশুভ বার্তা বহন করেছিল, কারণ উপরোক্ত তিনটি দেশেই ব্রিটিশ আর্থিক স্বার্থ জড়িত ছিল।

এই মহামন্দা উত্তর আমেরিকার শিল্প অর্থনীতির ওপর সর্বনাশা প্রভাব ফেলেছিল। ১৯২৯ থেকে ১৯৩১ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পোৎপাদন এক-তৃতীয়াংশ হ্রাস পায়। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত বিদ্যুৎ উৎপাদনকারী সংস্থা ওয়েস্টিংহাউস-এর বিক্রি প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ কমে যায়। সংস্থার নিট আয় ৭৬ শতাংশ হ্রাস পায়। ১৯৩১ সালে জাতিসংঘ একটি তালিকা তৈরি করে জানায় যে অস্ট্রেলিয়া, আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, বলিভিয়া, চিলি, কিউবা, মিশর, ভারত ও অন্যান্য দেশের অর্থনীতির ওপর এই মন্দা

বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছে। এরিখ হব্‌স্‌বম লিখেছেন—মন্দা আক্ষরিক অর্থেই বিশ্বায়িত হয়েছিল (It made the Depression global in the literal sense.)। বিশ্বের অধিকাংশ দেশই, বিশেষত ইউরোপীয় দেশগুলি তাদের বিদেশি ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হয়। এই পরিস্থিতিতে মার্কিন রাষ্ট্রপতি হুভার কতকগুলি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব দেন। ১৯৩১ সালের ২০ জুন তিনি বিভিন্ন অধমর্ণ দেশের সরকারগুলিকে প্রস্তাব দেন যে তারা মার্কিন সরকারকে ঋণ পরিশোধ ১ বছরের জন্য স্থগিত রাখতে পারে। কিন্তু একই সঙ্গে রাষ্ট্রপতি হুভার শর্ত আরোপ করেন যে অন্যান্য উত্তমর্ণ দেশও একই নীতি অবলম্বন করবে অর্থাৎ তাদের অধমর্ণ দেশগুলিও ঋণ পরিশোধের বিষয়টি ১ বছরের জন্য স্থগিত রাখবে। এমনকি জার্মান ক্ষতিপূরণ দানের বিষয়টিও স্থগিত রাখা হবে। এই প্রস্তাব "হুভার স্থগিতাদেশ" (Hoover moratorium) নামে বিখ্যাত। প্রবল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে হুভারের প্রস্তাবকে স্বাগত জানানো হল। কিন্তু কেবল মাত্র ফ্রান্স হুভারের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তীব্র আপত্তি জানায়, কারণ জার্মান ক্ষতিপূরণের অঙ্ক থেকে ফ্রান্সের প্রাপ্য ছিল সবচেয়ে বেশি। আলাপ আলোচনার পর অবশ্য ফ্রান্সও হুভার স্থগিতাদেশ মেনে নেয়।

মহামন্দা বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে বিভিন্ন ভাবে প্রভাবিত করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালি ও অন্যান্য কিছু দেশ শুল্ক সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে। উদ্দেশ্য ছিল আমদানি বাণিজ্য হ্রাস করে নিজেদের শিল্পকে সুরক্ষিত রাখা। ১৯৩১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটেন তার স্বর্ণ মান ত্যাগ করে এবং ব্রিটিশ মুদ্রা পাউন্ডের মূল্যমান হ্রাস করে। নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক ইত্যাদি দেশও ব্রিটেনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে। জার্মানি বিদেশে স্বর্ণ রপ্তানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং তারপর স্বর্ণ মান পরিত্যাগ করে। তীব্র বেকার সমস্যা এবং মুদ্রা ব্যবস্থা ও আর্থিক সংস্থাগুলির ক্রমবর্ধমান সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে ইউরোপীয় দেশগুলির সরকারেরা সনাতন পদ্ধতি গ্রহণ করে। মূল্য সংকোচন নীতি, ভারসাম্যের বাজেট, সরকারি কর্মচারীদের বেতন হ্রাস, শ্রমিক ছাঁটাই ইত্যাদি পদক্ষেপ করার মাধ্যমে সরকারগুলি সমস্যার সমাধান চেয়েছিল। কিন্তু এই পদক্ষেপ সফল হয়নি। জেমস জল সঠিক ভাবেই মন্তব্য করেছেন—এগুলির ফলে ক্রয়ক্ষমতা আরও হ্রাস পেল এবং বেকারত্ব বৃদ্ধি পেল (This had the effect of diminishing purchasing power still further and increasing unemployment still more.)।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যিক কাঠামো ভেঙে পড়ার ফলে শোচনীয় ক্ষতির শিকার হয়েছিল ব্রিটিশ অর্থনীতি, কারণ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের বিভিন্ন দেশে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ জড়িত ছিল। ১৯৩১ সালে ব্রিটিশ বাজেটে ১০০ মিলিয়ন পাউন্ড ঘাটতি দেখা দেয়। ব্রিটিশ বিনিময় মাধ্যম স্টারলিং-এর মূল্যমানের দ্রুত অবনতি ঘটে। মন্দা জনিত সমস্যার মোকাবিলায় ব্যর্থ ব্রিটেনের শ্রমিক দলের সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। সর্বদলীয় একটি জাতীয় সরকার ব্রিটেনের শাসনভার গ্রহণ করে। ব্রিটেনের নতুন সরকার আর্থিক সংকট মোচনের উদ্দেশ্যে জনসাধারণের ওপর বাড়তি করের বোঝা চাপায় এবং রাষ্ট্রীয় ব্যয় উল্লেখযোগ্য হারে সংকোচন করে। উপরোক্ত পন্থাগুলি গ্রহণ করে ব্রিটেনের নতুন সরকার বাজেটের ৯০ মিলিয়ন পাউন্ডের ঘাটতি পূরণ করেছিল। তারপরই ব্রিটেন তার স্বর্ণমান ত্যাগ করার নাটকীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

জার্মান ক্ষতিপূরণ সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্দেশ্যে ১৯৩২ সালের জুন মাসে ল্যসেন সম্মেলন আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলন এককালীন ক্ষতিপূরণ দানের ভিত্তিতে যাবতীয় জার্মান ক্ষতিপূরণ বাতিল করে দেয়। জার্মান ক্ষতিপূরণ সমস্যা চূড়ান্ত ভাবে সমাধিস্থ হয়। ১৯৩৩ সালের জুন মাসে লন্ডনে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন বসে। কিন্তু এই সম্মেলন কোনো ইতিবাচক সমাধানের পথ দেখাতে ব্যর্থ হয়, কারণ অধিকাংশ দেশই তখন 'অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ' (Economic Nationalism)-এর নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এমনকি অর্থনৈতিক উদারপন্থা ও মুক্ত বাণিজ্যের সব চেয়ে বড়ো প্রবক্তা গ্রেট ব্রিটেন পর্যন্ত সে মুহূর্তে অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদের প্রভাব মুক্ত হতে পারেনি। তদুপরি বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশেষ সহযোগিতা করেনি। ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট নতুন মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। এই সময়ের মধ্যে গোটা আর্থিক ব্যবস্থা পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার স্বর্ণ মান ত্যাগ করে এবং প্রায় ৩০ শতাংশ হারে মার্কিন ডলারের অবমূল্যায়ন ঘটে। মহামন্দার বিধ্বংসী প্রভাব থেকে অর্থনীতিকে মুক্ত করার তাগিদে রুজভেল্ট মার্কিন অর্থনীতির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করেন। রুজভেল্টের এই পদক্ষেপ 'নয়া-অর্থনীতি' (New Deal) নামে পরিচিত। নয়া-অর্থনীতি বা New Deal-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল—একটি সর্বনাশা অর্থনৈতিক মন্দা মোকাবিলা করার উপায় জনকল্যাণমূলক কার্যাবলির মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা, সরকারি তহবিল থেকে ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করা, সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়ানো এবং ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া। সার্বিক বিচারে 'নয়া-অর্থনীতি' ছিল একটি বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ।

১৯৩০-এর দশকের মহামন্দা নতুন অর্থনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ লাভের পথ প্রশস্ত করেছিল। অনেকেই মনে করেছিলেন এই মহামন্দা ছিল পুঁজিবাদের সংকটের এক অনিবার্য প্রতিফলন। পুঁজিবাদী সমাজের প্রকৃতি ও স্বরূপ সংক্রান্ত নতুন ধারণা উঠে আসে এই মহামন্দাকে কেন্দ্র করে। এ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ জন মেনার্ড কেইন্‌স (John Maynard Keynes)। কেইন্‌স তাঁর ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত *The General Theory of Employment, Interest and Money* গ্রন্থে নতুন অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ার একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার ক্ষেত্রে মূল্যবান অবদান রাখেন। কেইন্‌স তাঁর গ্রন্থে সম্পদ ও আয়ের স্বেচ্ছাচারী ও অসম বণ্টনের জন্য অর্থনৈতিক সমাজের ত্রুটিগুলির তীব্র সমালোচনা করেন। কেইন্‌স-এর অর্থনীতি অধিক কর্ম সংস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিল। কেইন্‌স-এর অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য বক্তব্য ছিল—শিল্পে কর্মরত শ্রমিকদের চাকুরির নিরাপত্তা থাকলে এবং তাদের আয় বৃদ্ধি পেলে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে এবং এই ভাবেই একটি মন্দা কবলিত অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। মার্কসবাদী অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সম্পূর্ণ বিকল্প একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু মার্কসবাদী বিশ্লেষণের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক মত হননি কেইন্‌স। তাঁর বক্তব্য ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সম্পূর্ণ বিকল্প অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তে পুঁজিবাদের আপত্তিকর বিষয়গুলি বাদ দিতে হবে এবং তাহলেই পুঁজিবাদী অর্থনীতি দক্ষতার সঙ্গে কাজ করতে পারবে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির মানবিক মুখের সন্ধান করেছিলেন কেইন্‌স। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং ফ্যাসিস্ট কর্তৃত্ববাদী সমাজের মাঝখানে একটি মধ্যপন্থার সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন তিনি।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ১৯২৯ থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত চলা অর্থনৈতিক মহামন্দা ছিল পুঁজিবাদী অর্থনীতির সংকটের প্রতিফলন। এই সংকটজনিত মন্দা বিশ্ব অর্থনীতির ওপর বিধ্বংসী প্রভাব ফেলেছিল। কার্ল মার্কস বিশ্বাস করতেন পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ার অঙ্গ হিসাবে সংকটের চক্র বারবার ঘুরে ফিরে আসে এবং সব শেষে পুঁজিবাদ নিজস্ব অভ্যন্তরীণ সংকটজনিত আঘাতের শিকার হয়। বিগত এক শতক জুড়ে পুঁজিবাদের বিকাশ ও অগ্রগতি এক কথায় ছিল চমকপ্রদ, যদিও সংকটের চক্র জনিত ক্ষণস্থায়ী বিপর্যয় মাঝে মধ্যে পুঁজিবাদী অর্থনীতির অগ্রগতির পথে সামান্য বাধা সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু ১৯২৯-৩০ সালের বিপর্যয়ের চরিত্র ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। হব্‌স্‌বম লিখেছেন—পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশের ইতিহাসে এই প্রথম দেখা গেল যে অর্থনৈতিক সংকট গোটা ব্যবস্থাটাকেই

প্রায় বিপন্ন করে তুলেছে। আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই যে পুঁজিবাদী বিকাশের বক্ররেখার দীর্ঘকালীন উত্থান স্তব্ধ হয়ে গেল।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন মহামন্দা জার্মানিতে হিটলার ও নাৎসি দলের উত্থানের পথ প্রশস্ত করেছিল। মহামন্দা জার্মান অর্থনীতিকে বিধ্বস্ত করেছিল। এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে আঘাত করেছিলেন হিটলার এবং রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেছিলেন। মহামন্দার কবলে পড়ে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলি যখন সমাধানের পথ খুঁজছিল এবং বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রনায়করা যে-কোনো ভাবে আর্থিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন, সে মুহূর্তে সুযোগকে কাজে লাগিয়ে কিছু শক্তি তাদের সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে তৎপর হয়ে ওঠে। ১৯৩১ সালে যাবতীয় আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে জাপান অন্যায় ভাবে মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয়। জাতিসংঘ যখন জাপানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে প্রয়াসী হয়, জাপান তৎক্ষণাৎ জাতিসংঘের সদস্যপদ ত্যাগ করে। হিটলারের নেতৃত্বাধীন জার্মানিও জাতিসংঘের সঙ্গে যাবতীয় সংস্রব ত্যাগ করে এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনকে (Disarmament Conference) ব্যর্থতায় পর্যবসিত করার জন্য যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ১৯৩৩ সাল থেকে মহামন্দা জনিত আর্থিক সংকট কাটতে শুরু করে। অর্থনৈতিক স্থিতাবস্থা পুরোপুরি ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়নি ঠিকই, তথাপি ১৯৩৩ সালে তীব্র আর্থিক সংকটের পরিসমাপ্তি লক্ষ করা গেল। বিশ্ব অর্থনীতি স্বাভাবিক রাস্তায় হাঁটতে শুরু করল। কিন্তু তীব্র রাজনৈতিক সংকট ইউরোপকে গ্রাস করে ফেলে। ই. এইচ. কার যথার্থই মন্তব্য করেছেন—১৯৩৩ সালে যখন অর্থনৈতিক সংকটের মেঘ কেটে যেতে শুরু করে, ঠিক সেই মুহূর্তে রাজনৈতিক পরিবেশ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয় (In 1933, the first rift in the economic clouds coincided with a fresh darkening of the political horizon.)।